i¨v‡ei mvdj¨, PÆMv‡gi 21 Rb `al mšvmx †Mßvi

G‡`i †KDB Ôµmdvqv‡iÕ wbnZ nqwb... KviY Iiv

wkwei K¨vWvi!

সুমি খান চট্টগ্রাম থেকে

বারবার আলোচনায় আসছে র‍্যাবের হাতে সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ছে, ক্রসফায়ারে নিহত হচ্ছে, শুধু বেঁচে যাচ্ছে শিবির ক্যাডাররা। এ অভিযোগ অস্বীকার করে র‍্যাব-৭ কমান্ডার কাজী এমদাদুল হক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ‘আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে শিবির ক্যাডারদের এতো কষ্ট করে গ্রেপ্তার করা যথেষ্ট নয়- হত্যা করতে হবে? আল্লাহ যার রিজিকে যেমন মৃত্যু রেখেছেন তার তেমন মৃত্যু হবে। আমি তো কাউকে হত্যা করতে পারবো না। ছাত্রলীগ নেতা মাছুম যদি ক্রসফায়ারে না পড়তো, আমাকে সবাই আ.লীগ বানিয়ে ফেলতো। র‍্যাব আইনের পথে চলে। সন্ত্রাস দমনে আমরা সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করি। তারা গুলি করলে আমরা গুলি করতে বাধ্য হই। কোনো রাজনৈতিক দলকেই আমি সাপোর্ট করি না।’

এ পর্যন্ত অসংখ্য অভিযানের পরও চট্টগ্রামে শিবিরের বিপুল অস্ত্রভান্ডার এবং বিশাল ক্যাডার বাহিনীর তেমন কিছুই করতে পারেনি র‍্যাব। অথচ বৃহত্তর চট্টগ্রামে জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসী আধিপত্য বজায় রেখে অন্যান্য সন্ত্রাসীর নির্মূল প্রচেষ্টা কার্যত পুরো জাতিকে ভয়াবহ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হবে। অন্যদিকে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী থেকে আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ী গ্রেপ্তারে র‍্যাবের সাফল্য ম্লান হয়ে যায় এক গডফাদার গ্রেপ্তারের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ায়।

তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তালিকায় র‍্যাব দল মত নির্বিশেষে সকল পর্যায়ের সন্ত্রাসীদের টার্গেট করেছে- এমন বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবের রয়েছে বিরাট ফারাক। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারি এই দু’মাসে আলোচিত ১৫টি অভিযানে তালিকাভুক্ত ১৮ শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারে সফল হয়। এদের মধ্যে ‘লাইন অব ফায়ারে’ পড়ে ‘এনকাউন্টারে’ নিহত হয়েছে ৫ জন- এরা কেউ শিবিরের নয়। এর আগে নিহত ১৩ জনের কেউ শিবিরের ছিল না। পুলিশ আইনের হাতে তুলে দেবে অপরাধীদের এটাই স্বাভাবিক। প্রশ্ন উঠেছে, ‘ক্রসফায়ার’ বা ‘এনকাউন্টার’ কেন হচ্ছে? কাদের স্বার্থে? কৌশলে সুরক্ষা দেয়া হচ্ছে কাদের?

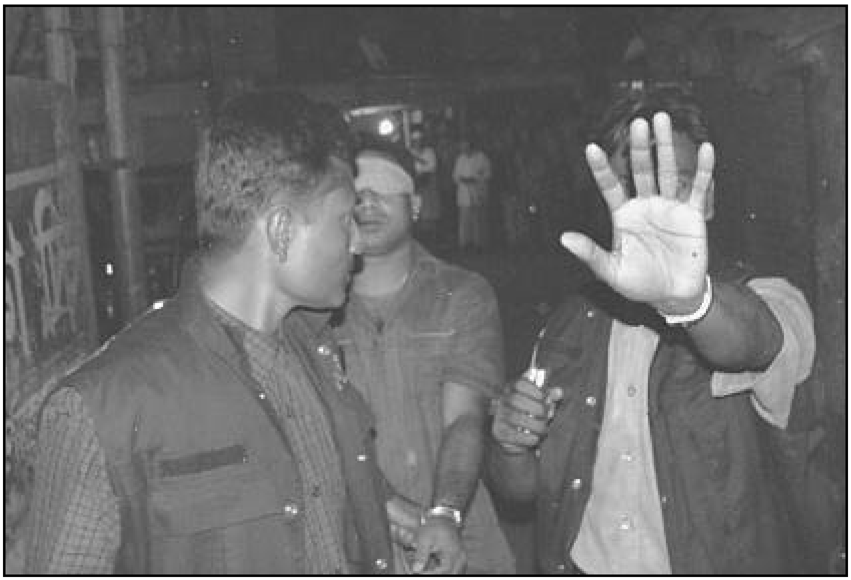

QvÎ`j K¨vWvi BKevj¨v aiv covi ci µmdvqv‡i wbnZ n‡q‡Q| RvgvqvZ-wkwe‡ii †Kv‡bv K¨vWv‡ii †¶‡Î GgbUv N‡Uwb

রোহিঙ্গা নেতা আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ী

গত ৭ সেপ্টেম্বর ’০৪ বিকেল ৪.৩০টায় চট্টগ্রামের অভিজাত আবাসিক এলাকা খুলশীতে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় মোঃ শফিকুর রহমানকে। র‍্যাবের প্রেস রিলিজে বলা হয়, শফিকুর রহমান ১০ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিল। তার ভাই বদিউর রহমান ও মাহমুদুর রহমানের সহযোগিতায় ‘বদি কোম্পানি’ সিন্ডিকেটের মাধ্যমের কক্সবাজারের আরেক সিন্ডিকেট এজাহার কোম্পানির সঙ্গে মিলে দেশের সর্ববৃহৎ চোরাচালান পরিচালনা করছে এরা। বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন ট্রলার ও ট্রাকযোগে সার, সিমেন্ট, রড, ওষুধ পাচার করছে মিয়ারমারে। মিয়ানমার থেকে লবণ, মসলা, ইলেক্ট্রোনিক্স আর অস্ত্র আনছে দেশে। হুন্ডি ব্যবসায়ী শফিকুর রহমান সিঙ্গাপুর ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশে অবৈধ বসবাসকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের জনসাধারণের টাকা ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূতভাবে পাচার করছে, ডলারও পাচার করছে। শফিকুর রহমানকে র‍্যাব সূত্রে RSO রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন ও ARNO-র নির্ভরযোগ্য পৃষ্ঠপোষক ও চাঁদাদাতা হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। ১১টি পাসপোর্টের (বাংলাদেশী) মধ্যে ৩টি একসঙ্গে তিনি ব্যবহার করছেন- যা সম্পূর্ণ বেআইনি। চট্টগ্রামের শিপিং ব্যবসায়ী জাকির হোসেন হত্যা (১১ আগস্ট ’০৩) মামলায় শফিকুর রহমান ও তার ভাইদের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে র‍্যাবের কাছে।

সিঙ্গাপুরে ইউনি ওভারসিজ প্রা:লি: মেরিন প্যারেড পোস্ট অফিস, পোস্ট বক্স নং ৬৯৪, সিঙ্গাপুর ৯১৪৪০৭ ঠিকানায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আড়ালে এই আসামি চোরাচালান পরিচালনা করেন। র‍্যাব এই আসামিকে আন্তর্জাতিক চোরাকারবারি ও অস্ত্র চোরাচালান সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত থাকার তথ্য প্রমাণসহ গ্রেপ্তার করেছে।

শফিকুর রহমানের কাছ থেকে উদ্ধার

হয়েছে : ১. বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানের মুদ্রা ও নোট, যার আনুমানিক মূল্য পাঁচ লাখ টাকা। ২. ১১টি বাংলাদেশী পাসপোর্ট। ৩. বিদেশী বিভিন্ন ব্যাংকের ১৫টি ক্রেডিট কার্ড। ৪. বিভিন্ন দেশের ছয়টি ডিসকাউন্ট কার্ড। ৫. একটি সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড। ৬. একটি ক্যালিফোর্নিয়ার আইডি কার্ড। ৭. একটি সিঙ্গাপুরের ড্রাইভিং লাইসেন্স। ৮. ব্যাকশোন ব্যাংক ব্যাংক অব আমেরিকা হাবিব ব্যাংক এবং এজি জুরিখের চেক বই। ৯. চোরাচালানিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ডকুমেন্ট। টেকনাফের শাহপরী দ্বীপের নবী হোসেনের পুত্র শফিকুর রহমানসহ বদি কোম্পানি এবং এজাহার কোম্পানি দেশের সর্ববৃহৎ চোরাচালানি সিন্ডিকেট- এ তথ্যপ্রমাণ হাতে নিয়েও র‍্যাব নির্মূল করতে পারছে না শক্তিশালী এ চক্রটি। এ পর্যন্ত এ সিন্ডিকেটের অন্য কোনো সদস্যও গ্রেপ্তার হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এ তৎপরতা ব্যাহত হলো কোন্ স্বার্থে?

গ্রেপ্তারকৃত হাজী শফী এখন মুক্ত

১০ সেপ্টেম্বর '০৪ 'ক্রসফায়ারে' নিহত হয়েছে আহমইদ্যা তার ঘনিষ্ঠ ক্যাডার মিনহাজসহ। এর আগে ১৭ জুলাই গ্রেপ্তার হয় আজরাইল বাহিনী প্রধান আজরাইল দেলোয়ার, শিবিরের দুর্ধর্ষ ক্যাডার সিএমপির তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী। র‍্যাবের প্রেস রিলিজে বলা হয়, তার বিশাল অস্ত্রভান্ডারের সন্ধানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ৬ মাস পরও তার এ অস্ত্রভান্ডারের কিছুই উদ্ধার হয়নি। র‍্যাব সূত্রে বলা হয়, নগর পুলিশের মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল বিডিআর সেলিমকে নিয়ে চন্দনপুরায় দেলোয়ার ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলে জামিনে বেরিয়ে এসে।

গত ৪ ডিসেম্বর '০৪ 'লাইন অব ফয়ারে' পড়ে নিহত হয় ফটিকছড়ির দুর্ধর্ষ ছাত্রদল ক্যাডার ওসমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সজল নাথ। এর আগে ১৮ আগস্ট একই গ্রুপের নেতা ইয়াকুব একে ৪৭সহ গ্রেপ্তার হয় কিলার ওসমানের বাড়ি থেকে '০৪। র‍্যাবের প্রেস রিলিজে লেখা হয়েছে, র‍্যাবের ২টি স্ট্রাইকিং ফোর্স ও তিনটি ব্লকিং ফোর্সের ৫০ জনের দল ৫টি গাড়িতে ৫ দলে বিভক্ত হয়ে কিলার ওসমানের বাড়ি চারদিক থেকে ঘিরে অভিযান করে ইয়াকুবকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে। ইয়াকুব তার একে-৪৭ থেকে র‍্যাবের এক নম্বর স্ট্রাইকিং ফোর্সের ওপর ১৫ রাউন্ড গুলি ফায়ার করে। র‍্যাব সদস্যরাও তাকে গুলি করে। কিলার ওসমানের ভাই সোলেমান কিরিচ দিয়ে র‍্যাব সদস্যদের প্রতিহত করলে গুলিবিদ্ধ হয় এবং দু'জনেই গ্রেপ্তার হয়। এদের ফটিকছড়ি থানায় সোপর্দ করা হয়। একই বাহিনীর দুর্ধর্ষ ক্যাডার শফি গ্রেপ্তার হয় ১৭ ডিসেম্বর। পাওয়া যায় একটি ৭ এমএম বিদেশী রাইফেলসহ ৩১ রাউন্ড ৭ ও এমএস রাইফেলের গুলি। গ্রেপ্তার হয় মিরপুর শেওড়াপাড়া থেকে। র‍্যাব-৭-এর একটি বিশেষ দল ঢাকায় গিয়ে দুর্ধর্ষ অভিযানে তাকে গ্রেপ্তার করে। প্রশ্ন ওঠে, বিশেষ কেউ লাইন অব ফায়ারে পড়ার রহস্য কোথায়? ফটিকছড়িকে যারা কিলিং জোনে পরিণত করেছে এদের মূল নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠদের পুলিশের হাতে সোপর্দ আবার জামিনে মুক্তির পথ করে দিয়েছে। কালা মাহবুব গ্রেপ্তার হবার দীর্ঘদিন পরও তাকে রিমান্ডে না নিয়ে আয়েশী হালে রাখা হয়েছে কারা হাসপাতালে। এসবই র‍্যাবের নখদর্পণে। জনগণের কাছেও কিছুই গোপন নয়। এখনো কিলিং জোন ফকিটছড়িতে কিলার ওসমান সক্রিয়। রাঙ্গামাটির চেয়ারম্যান আবু ইউসুফ মোঃ আলমগীরের প্রকাশ্য উক্তি- 'র‍্যাব আর ক'দিন, তোমরা বেরিয়ে আসতে পারবে ক'দিন পরই- এই ভরসার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে কেন?

আইনের আওতায় নেই শিবির ক্যাডার সাজ্জাদ, হাবিব খান

র‍্যাব-৭-এর অব্যাহত অভিযানে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সন্ত্রাসীরা আত্মগোপন করে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের সন্ত্রাস। এর মধ্যে শিবির ক্যাডার তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ কখনো সীতাকুন্ড, কখনো প্রত্যন্ত এলাকায় থেকে তার সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ অপরাধমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এ তথ্য র‍্যাব সূত্রে স্বীকার করে বলা হয়, হাবিব খান এবং সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার আমাদের জন্য হবে বিরাট সাফল্য। সাজ্জাদ সম্প্রতি জামিনে মুক্ত হলে চট্টগ্রাম কারাগারের পেছনের দরজা থেকে সাদরে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় জামায়াত সাংসদ। কারা কর্তৃপক্ষ এবং সিএমপির পক্ষ থেকে একে অপরকে দোষারোপ করা হয়েছে যে কেন আবার জেল গেট থেকে সাজ্জাদকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা হলো না? কমিশনার লিয়াকত হত্যাসহ আট মার্ডার হত্যা মামলার আসামি তালিকাভুক্ত এ টপটেররকে আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখার পেছনে রয়েছে জামায়াতের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। আন্ডারওয়ার্ল্ডে সাজ্জাদ বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এবং মূর্তিমান আতঙ্ক।

হাবিব খান- যার নামে কেঁপে ওঠে একজন সাধারণ নাগরিকের প্রাণ। ৮ মার্ডার, ছাত্রলীগ নেতা আলী মুর্তজা হত্যা, জামালউদ্দিন অপহরণসহ অসংখ্য হত্যা, অপহরণ চাঁদাবাজির মূল আসামি হাবিব খানও শিবিরের দুর্ধর্ষ ক্যাডার। এবং সিএমপির তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী। হাটহাজারী থেকে চট্টগ্রাম মহানগীর পুরোটাই তার দখলে। এদের বিরুদ্ধে র‍্যাবের সফল অভিযান পরিচালিত হয়নি।

গ্রেপ্তারকৃত দুর্ধর্ষ ২১ শিবির ক্যাডার

১৭ জুলাই '০৪ : আজরাইল বাহিনী প্রধান আজরাইল দেলোয়ার ৮ মার্ডার কমিশনার লিয়াকত আলী হত্যা, জামালউদ্দিন অপহরণ মামলায় অভিযুক্ত। সাবেক শিবির ক্যাডার আহমদইদ্যা হত্যা প্রচেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত (শাহজাহান চৌধুরী এমপির অফিসে বসে তার নির্দেশে এ পরিকল্পনা গৃহীত হয় বলে সাংবাদিকদের কাছে তার স্বীকারোক্তি)।

১৮ জুলাই '০৪ : র‍্যাব অভিযানের ছাত্রলীগ নেতা কাশেমসহ ১২ হত্যা মামলার আসামি। ২ অক্টোবর '০১ পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধের পর একে-৫৬, কাটা রাইফেল ও সহযোগী সাজ্জাদসহ ধরা পড়ে।

২৩ জুলাই '০৪ : আছিয়া কলোনি থেকে গ্রেপ্তার শিবির ক্যাডার নাসির ও দিদার। হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসের অভিযোগে বিভিন্ন থানায় এদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।

৩ আগস্ট '০৪ : ফটিকছড়ির বাবুল বাহিনী প্রধান ইয়াকুব আলী বাবুল ও শিপন

বাহিনী প্রধান ফোরকানউদ্দিন শিপনকে ১টি একে-৪৭ রাইফেল, ম্যাগাজিনসহ একে-৪৭-এর ৪৪ রাউন্ড গুলি, একটি ডিবিবিএল বন্দুকসহ নগরীর চকবাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের স্বীকারোক্তিতে গ্রেপ্তার হয় আহসানুল করিম, জয়নাল, নাসির উদ্দিন বাদশা, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। উল্লেখ্য, হুন্ডির টাকা ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা জেনে যায় র‌্যাব-৭; এতেই ধরা পড়ে যায় এই দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী দল। তাদের বিরুদ্ধে ৫টি হত্যা মামলা (২৩(৪)০২), (৭(৮)০২), (০১(১)০২), (৮(১২)০২), (৭(১)০৪), ১টি নারী শিশু নির্যাতন মামলা (১(৭)০৪) রয়েছে ফটিকছড়ি থানায়। শিপনের বিরুদ্ধে ৪টি হত্যা মামলা (৭(১)০৪), (৮(১২)০৩), (১৮(৪)০২), (১৩(৯)০২), একটি নারী শিশু নির্যাতন মামলা (১(৭)০৪) রয়েছে একই থানায়।

১০ সেপ্টেম্বর '০৪ : ফটিকছড়ির ঈদিশপুর গ্রাম থেকে জামায়াত ক্যাডার তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী ভাগিনা রমজান ও জামাই ফারুক গ্রেপ্তার হয়। হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজিসহ অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে এই দুই দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে। ১১ সেপ্টেম্বর '০৪ র‌্যাব কার্যালয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতে ভাগিনা রমজান বর্ণনা দিয়েছে তার সন্ত্রাসী জীবনে উত্থান এবং জামায়াতের ক্যাডার হিসেবে নিজের সকল অপরাধের স্বীকারোক্তি। অকপটে বলেছে 'নিজামীরা মুখে ধর্মের কথা বলে আমাদের দিয়ে মানুষের রগ কাটায়, হত্যা করায় (সূত্র: ১৭ সেপ্টেম্বর '০৪ সাপ্তাহিক ২০০০)।

১৫ ডিসেম্বর '০৪ : চকবাজার আল আকাবা আবাসিক হোটেল থেকে গ্রেপ্তার হয় পাঁচ শিবির ক্যাডার আবু ইউসুফ, ইলিয়াস, জাহাঙ্গীর, আলমগীর ও মানিক। শিবির ক্যাডার নাছির কারাগারের ভেতর থেকে এদের মাধ্যমে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি পরিচালনা করতো। এদের মধ্যে আবু ইউসুফ ১২ বছরের সাজপ্রাপ্ত পলাতক আসামি।

৩০ ডিসেম্বর ০৪ : অক্সিজেন মোড় থেকে শিবির ক্যাডার শীর্ষ সন্ত্রাসী গিট্টু নাছিরের সহযোগী জামাই কাশেম গ্রেপ্তার হয় নগরীর অক্সিজেন মোড় থেকে। শিবির ক্যাডার ছোট সাইফুল, তার বড় ভাই ও বোনসহ তিন হত্যা মামলার (নং ১৯, তাং-৩০-৬-০৪) আসামি জামাই কাশেমের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজির মামলা রয়েছে। র‌্যাবের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পর জামাই কাশেম তার বসতঘরে খাটের নিচ থেকে একটি এলজি বন্দুক ও ২টি এলজি বন্দুকের কার্তুজ বের করে দেয়।

২ ডিসেম্বর '০৪ : চকবাজার উর্দু গলি থেকে র‌্যাব-৭, ফটিকছড়ি থানা অভিযানে গ্রেপ্তার করে ফটিকছড়ির সন্ত্রাসী শিবির ক্যাডার বাবুল-শিপন বাহিনীর ক্যাডার (৩০৩ রাইফেলসহ) বাইট্যা নাজিমকে। শীর্ষ নাজিমের নামে ফটিকছড়িতে ডাকাতি, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, খুনসহ সন্ত্রাসের অভিযোগ রয়েছে।

১৫ জানুয়ারি '০৫ : আগ্রাবাদ থেকে গ্রেপ্তার হয় শীর্ষ সন্ত্রাসী মোঃ সোলায়মান ও রুকনউদ্দিন চৌধুরী রিপন। এদের মধ্যে রিপনের উত্থান ২০০০ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে শিবিরের সাধারণ সম্পাদক পদে। এক পর্যায়ে একে-৪৭ নিয়ে শিবির ক্যাডার নাছিরের সঙ্গে বিরোধ হয় এবং দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে। আহমইদ্যার সঙ্গে যোগ দেয়, গড়ে তোলে সন্ত্রাসী বাহিনী। গত ২ বছরে চট্টগ্রামে সংঘটিত অধিকাংশ অপরাধ তৎপরতায় এই বাহিনী সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। আহমইদ্যা র‌্যাবের সঙ্গে 'ক্রসফায়ারে' নিহত হবার পর রিপন তার বাহিনীর একাংশের দায়িত্ব নেয়।

চাঞ্চল্যকর এইট মার্ডারের আসামি রিপনের ডাকে সোলায়মান শিবির ক্যাডার হিসেবে যোগ দেয় তার সঙ্গে। একটি বিদেশী পিস্তলসহ গ্রেপ্তারকৃত রিপন গত তিন বছরে কোটিপতি হয়ে গেছে বলে পুলিশ সূত্রে প্রকাশ।

১৮ জানুয়ারি '০৫ : ঢাকা মৎস্য ভবনের সামনের ফুটপাত থেকে র‌্যাব ঢাকার সহায়তায় র‌্যাব-৭ গ্রেপ্তার করে ২৯ মামলার দুর্ধর্ষ আসামি টপটেরর আক্তার হামিদকে। তাকে গ্রেপ্তার করে। শিবির ক্যাডার আক্তার হামিদ মহেশখালী থানার হোয়াক্যাং ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মাবুদ চৌধুরীর তিন ছেলের মধ্যে সবার বড়। চিংড়ি ঘের দখল তিন ভাইয়ের বিপুল আয়ের উৎস। আশির দশকের শুরুতে তার দলের নেতৃত্ব দুই ভাইয়ের হাত দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হয় আক্তার হামিদ। যথারীতি শিবিরের হত্যা, সন্ত্রাস, হল দখলের নেতৃত্বে থাকে আক্তার। '৯০ থেকে মহেশখালীতে ফিরে আবার ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, পাশাপাশি অস্ত্রের ব্যবসাও চালিয়ে নেয়। সমুদ্রপথে যতো অস্ত্রের চালান তার দায়িত্ব ছিল আক্তারের সন্ত্রাসী বাহিনী। একটি হত্যা, সাতটি হত্যা প্রচেষ্টা, অসংখ্য চিংড়ি ঘের দখল এবং অস্ত্র মামলা রয়েছে আক্তারের বিরুদ্ধে। এদের তিন ভাইকে গ্রেপ্তারের চেষ্টায় র‌্যাব বেশ কয়েকবার মহেশখালীতে অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়। বিশাল অস্ত্রভান্ডার নিয়ে আক্তার হামিদের বাহিনী মহেশখালীর বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে আছে বলে সূত্রে প্রকাশ। ঢাকা থেকে র‌্যাব-১-এর সহায়তায় এ দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীর গ্রেপ্তার নিঃসন্দেহে র‌্যাব-৭-এর সাফল্য বলে মনে করছে এলাকার সন্ত্রস্ত জনগণ। তবে তার স্বীকারোক্তি মতো ৫টি অস্ত্র, ২টি দা এবং ১০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়- যা তার বিশাল অস্ত্রভান্ডারের তুলনায় কিছুই না। এখনো মহেশখালীর জনগণ এ অপশক্তির হাতে জিম্মি।

২৬ জানুয়ারি '০৫ : পুলিশ গ্রেপ্তার করে শিবির ক্যাডার নাছিরের মামা শীর্ষ সন্ত্রাসী মোঃ শাহীনকে। ২৬ ঘণ্টা পুলিশ হেফাজতে থাকার পর র‌্যাব-৭ ফটিকছড়ি থানা থেকে এনে ৮ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর উদ্ধার করে ১টি এম-১৬ রাইফেল। ফটিকছড়ি থানা থেকে গ্রেপ্তারকৃত শিবির ক্যাডার শাহিনের বিরুদ্ধে বাইল্যাতোতা খুনসহ তিনটি মামলা রয়েছে, কালু মেম্বার হত্যা'।

র‌্যাব সূত্রে প্রকাশ '৯৫-'৯৬তে শিবির ক্যাডার নাছিরের মাধ্যমে তার সন্ত্রাসে হাতেখড়ি। '৯৬তে ফটিকছড়ির জামায়াত নেতা জাহাঙ্গীর চৌধুরীর পক্ষে সংসদ নির্বাচনে কাজ করে বলে এক জ্ঞাতি বোনের ছেলে নাছিরের সঙ্গে যোগাযোগের কথা সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করে শাহীন। নিজেকে শিবিরের সমর্থক বলে স্বীকার করে। ফটিকছড়ির শাহনগরে মাছ চাষ এবং চকবাজারে একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নিয়ে শাহীন ব্যস্ত থাকে। দলীয় ক্যাডারবৃত্তি থেকে সরে আসার চেষ্টায় ছিল বলে র‌্যাব জানায়। তার স্বীকারোক্তি মতে, মাটির নিচ থেকে পলিথিন মোড়ানো অবস্থায় উদ্ধার হয় লক্কড়ঝক্কড় এ এম-১৬। এ অস্ত্র ১ বছর আগে আরেক শিবির ক্যাডার ফাটা নাছিরের (ঢাকা) থেকে পায় বলে সে জানায়। মৌলভী হারুনের খড়ের গাদার নিচে থেকে উদ্ধার হয় ২টি একনলা বন্দুক। র‌্যাব সূত্রে জানা যায়, এ পর্যন্ত গ্রেপ্তারকৃত সন্ত্রাসীদের থেকে জানা গেছে শাহীনের কাছে এম-১৬ থাকবার তথ্য। সে তথ্যের সূত্রে বিশেষ কৌশলে র‌্যাব উদ্ধার করে এ অস্ত্র। ২৮-১-০৫ তারিখে দুপুরে ফটিকছড়ি থানায় ফিরিয়ে দেয়া হয় শাহীনকে। জনসাধারণের আশঙ্কা হয়তো জামিনে মুক্তি পেয়ে খুব শিগগিরই আবার দলীয় দায়িত্বে শুরু হবে তার অপরাধ কর্মকান্ড।

এভাবে আইনের হাতে তুলে দেয়ার পরও নির্বিঘ্নে পার পেয়ে যাচ্ছে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীরা। নিরাপদ নাগরিক জীবন যেন দূরের কোনো গল্প। নাগরিক সমাজ সদা সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত। যেকোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে যেকোনো বিপদ। সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট বাহিনী আন্ডারওয়ার্ল্ডে নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত-শিবিরের অপশক্তি।

ভাগিনা রমজান এবং আহমইদ্যার অকপট উচ্চারণে জামায়াত-শিবিরের অস্ত্রভান্ডার এবং হত্যা, রগকাটা রাজনীতির বাস্তবতা বারবার উঠে এলেও সরকারের এলিট ফোর্স র‌্যাব এ ব্যাপারে রহস্যজনক ভূমিকায়। জিম্মি জনগণ। এ প্রশ্নে র‌্যাব-৭ কমান্ডার লে. ক. কাজী এমদাদ বলেন তার বাহিনীর সুনাম ক্ষুণ্নের দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যে এসব প্রচারণা। পত্র-পত্রিকার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন এসব পত্র-পত্রিকারই সৃষ্টি।